বিশেষ প্রতিবেদন

আদালতের ঐতিহাসিক রায়

n নির্দোষ প্রমাণিত জয় n ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন ১০ কোটি টাকা

লিখেছেন সুইডেন থেকে **দেলওয়ার হোসেন**

বাংলা ছবির অতি পরিচিত সংলাপের মতো হতে পারতো জয় রহমানের ডায়ালগ... 'ফিরিয়ে দাও আমার আটটি বছর,' এবং আরো আরো কতো কি! কিন্তু অমনটি উচ্চারিত হয়নি জয় রহমানের মুখ থেকে দীর্ঘ আট বছর জেলখানায় বন্দী জীবন থেকে মুক্তির পর। মুক্তি পেলেন তিনি গত ১৯ এপ্রিল। মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে বিজয়ীর বেশে। যে অপরাধে তিনি হয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সেই অপরাধকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দীর্ঘ আট বছরের বন্দী কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে এলেন স্বাধীন জগতে। সুইডেনের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এটি এক নজিরবিহীন ঘটনা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনো আসামির আট বছর জেল খাটার পর পুনর্বিচারের মাধ্যমে বেকসুর খালাস হওয়ার ঘটনা এর আগে কখনই ঘটেনি সুইডেনে। আর তাই এ ঘটনাটি সুইডেনে যেমন সৃষ্টি করেছে ব্যাপক চাঞ্চল্য তেমনি স্থাপন করেছে একটি নজিরবিহীন ইতিহাস। শুধু তাই নয়, একজন নিরপরাধ মানুষকে নির্মম সাজা দেয়ায় সুইডিশ বিচার বিভাগের ওপরও পড়লো এক অমোচনীয় কলঙ্কের দাগ। সে জন্যই ১৯ এপ্রিল জয় রহমানের মুক্তির খবরটি সুইডেনের তাবৎ সংবাদ মাধ্যমে হয়ে ওঠে প্রধান সংবাদ শিরোনাম। টিভি, রেডিও ও পত্রিকাগুলো দীর্ঘ সংবাদ প্রচারে মগ্ন হয়ে উঠেছিলো জয় রহমানকে নিয়ে। অপরাধীর খেতাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি সর্বস্তরের সুইডিশ জনতার কাছ থেকে লাভ করেন একজন 'হিরো'র মর্যাদা। জয় রহমানের প্রতিক্রিয়া ছিলো, সুইডেনের এই ভুল-রেসিস্ট (বর্ণ বিদ্বেষী) বিচার ব্যবস্থার জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে গোটা বিচার বিভাগকে। ক্ষমা চাইতে হবে গোটা রাষ্ট্রকে। এটাই হবে তার সবচেয়ে বড় ক্ষতিপূরণ। আর্থিক অঙ্কে তিনি পেতে পারেন সুইডেনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশী টাকায় ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা। কিন্তু জয় রহমান চান না এই ক্ষতিপূরণের টাকা। তিনি চান ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সেই

সরকারি পক্ষের কৌঁসুলিকে (পাবলিক প্রসিকিউটর) একটি সমুচিত শিক্ষা দিতে যিনি জয় রহমানকে শুধু মনগড়া খুনের অভিযোগেই অভিযুক্ত করেননি– উপরন্তু আদালত কক্ষে তিনি বাংলাদেশের গোটা জনগোষ্ঠীর ওপর লেপন করেছেন একটি কলঙ্কজনক অপবাদ– এই বলে যে, বাংলাদেশের যে সমাজে জয় রহমানের জন্ম, সেখানে অর্থের জন্য কিংবা অর্থের লোভে মানুষ খুন করা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আর তাই একই মোটিভ নিয়ে দরিদ্র দেশের এই অর্থলোভী মানুষটির পক্ষে ৭২ বছর বয়স্কা নিঃসঙ্গ পেনশনার মার্থা পেটারসনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করাটা মোটেও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত যাবজ্জীবনের সাজা জয় রহমান মাথা পেতে নিলেও সরকার পক্ষের মহিলা কৌঁসুলি এলিজাবেথ ব্যারিস্ট্রমের গোটা বাঙালি জাতি সম্পর্কে ঐ আপত্তিকর নোংরা উক্তিটিকে মোটেও মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করেন, এটা শুধু জয় রহমানের চরিত্রের ওপরই কালিমা লেপন করেনি, কালিমা লেপন করেছে গোটা বাঙালি জাতির ওপর। একটি জাতি বা তার সমাজ সম্পর্কে আদালতে এমন আপত্তিকর মন্তব্য করার অধিকার কোনো আইনজীবীর নেই। এ জন্যই জয় রহমান তার প্রতিক্রিয়ায় প্রথমেই দাবি করেন, কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ নয়, চাই গোটা সুইডিশ স্টেটের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা। এ বিষয়টি নিয়ে শুধু জয় রহমান একাই নন– তার এ প্রশ্নের যৌক্তিকতার সমর্থনে সোচ্চার হয়েছে সংবাদ মাধ্যমগুলোও। প্রশ্ন উঠেছে নিরপরাধ মানুষের প্রতি এই গুরুতর ভুল রায়ের সাজা ভোগ করবে কে? এই বিষয় নিয়েই জয় রহমান লড়বেন আদালতের বিরুদ্ধে। তার পক্ষে এখন সমবেত হয়েছে মানবাধিকার সচেতন বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার এক বিরাট জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের এক রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান জয় রহমান। বাবা লাল মিয়া ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন দু'বার। তার ১১ জন সন্তানের মধ্যে জয় রহমান ছিলেন অতি ডানপিটে। লেখাপড়ায় তার মন ছিলো না এতটুকু। স্কুলে যাতায়াত ছিলো কদাচিৎ। মায়ের চাপে পড়ে শেষমেশ ম্যাট্রিক উৎরে যান কোনো রকমে। তারপর নামকাওয়াস্তেই ছিলেন কলেজ ছাত্র। লেখাপড়ায় মনোনিবেশের নেশা-চিন্তা চুকে যায় অনেক আগেই। জড়িয়ে পড়েন সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনীতির সঙ্গে। সমস্যায় পড়েন '৭৫-'৭৬ সালে। বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেন '৭৭ সালে। প্রথমে প্যারিসে ৮ মাস, তারপর জার্মানিতে কাটে এক বছর। সর্বশেষে সুইডেনে আগমন ঘটে '৭৯ সালে। পরিচয় হয় সুইডিশ তরুণী মনিকার সঙ্গে। আশ্রয়লাভের আবেদন খারিজ হওয়ায় '৮২তে ফিরে যান দেশে। পরে মনিকা বাংলাদেশে গিয়ে জয় রহমানকে বিয়ে করে সুইডেন নিয়ে আসেন। এখন তাদের দু'সন্তান– এক ছেলে, এক মেয়ে। আন্না (১৬) ও ঝিলিক রহমান (১৪)। এদের কেউ বাংলা জানে না। ৮ ও ৬ বছর বয়সে ওদের বাবা জয় রহমান বৃহত্তর রাজধানী শহর স্টকহোমের স্যাতরাঁ এলাকার অধিবাসী ৭২ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধাকে খুনের দায়ের যান জেলে। ঘটনাটি ঘটে বৃদ্ধার বাসায় ১৯৯৩ সালের ২৩মে। খুনের দায়ে স্টকহোমের জজকোর্ট (stockholms tingsratt) জয় রহমানকে যাবজ্জীন কারাদণ্ডের রায় দেয় ১৯৯৪ সালে। পরে একই রায় প্রদান করা হয় হাইকোর্ট (svea hovratt) থেকেও।

> 'অর্থের জন্য মানুষ খুন করা বাংলাদেশের সমাজে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। হাইকোর্ট এসব যুক্তি-প্রমাণের ওপর ভর করেই জয় রহমানকে '৯৪ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। জয় রহমান নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও আদালত তার দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি'

জয় রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করার পেছনে যে প্রমাণগুলো আদালতে উপস্থাপন করা হয় তা হলো– খ্রিস্টমাসের ওয়ালমেটের কানি থেকে নেয়া একটি ফিতা। চিকন এই ফিতাটি দিয়ে ঐ বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। জয় রহমান করতেন বৃদ্ধদের সেবায় নিয়োজিত কম্যুনের হোম সার্ভিসের (Hemtjanst) কাজ। জয় রহমান কাজ করতেন দুই বাসায়। হত্যাকাণ্ডে যে ফিতাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ছিলো অন্য বাসার ওয়ালমেটের। যে বাসায় ঐ দিন জয় রহমান কাজ করেছিলেন। প্রমাণ করা হয় একই দিন জয় রহমান নিহত ঐ বৃদ্ধার বাসায়ও গিয়েছিলেন। অথচ ঐ দিন ঐ বাসায় জয় রহমানের ডিউটি ছিলো না। বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধ ছাড়াও জ্বালানি তেল ব্যবহার করে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। হত্যাকাণ্ডের স্থানে ঐ জ্বালানি তেল কেনার একটি রিসিপ্টও পাওয়া গিয়েছিলো যাতে দেখা যায় ঐ একই দোকান থেকে একই সময়ে জয় রহমান কফি ও অন্যান্য সওদাপাতি কিনেছিলেন। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে যে চুল পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ১০০ ভাগ নিশ্চিত ফল কারিগরি পরীক্ষায় না পেয়েও তাকে জয় রহমানের চুল হিসেবে প্রমাণ করা হয়। খুনের মোটিভ হিসেবে উল্লেখ করা হয়– জয় রহমান ছিলেন হাশিশের মতো বিপজ্জনক মাদকদ্রব্য সেবন ও নিয়মিত ঘোড়ার রেস খেলায় আসক্ত। এ কারণে তার ছিলো বাড়তি অর্থের চাহিদা। বৃদ্ধা মাসিক পেনশন ভাতা পেতেন ৬ হাজার ক্রোনার। ঘরে তার জমানো অর্থ ছিলো ১০ হাজার ক্রোনার। তাই বৃদ্ধার অর্থ লোপাট করার উদ্দেশ্যে তাকে খুন করা হয়। অথচ ঐ মুহূর্তে জয় রহমান ও তার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে গচ্ছিত ছিলো নগদ এক লাখ আঠারো হাজার ক্রোনার। আদালতে এই যুক্তির বিপক্ষে সরকারি প্রসিকিউটর বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সঞ্চিত অর্থে সহজে হাত দেয় না। অর্থের জন্য মানুষ খুন করা বাংলাদেশের সমাজে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। হাইকোর্ট এসব যুক্তি-প্রমাণের ওপর ভর করেই জয় রহমানকে '৯৪ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। জয় রহমান নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও আদালত তার দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। অগত্যা জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাবজ্জীবন দণ্ড কাটানোর নিয়তিকে মেনে নিয়ে শুরু করেন নিভৃত কারাবাস। এই নির্মম রায়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য পুনর্বিচারের উদ্দেশ্যে তিনি জেলখানা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে লেখেন হাজার হাজার চিঠি। তার আবেদনে কুমলা জেলখানার পাস্তর বেঙ্কট ইয়োরান উহানসন প্রথমে এগিয়ে আসেন। জয় রহমানের সঙ্গে জেলখানায় দেখা হয় '৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে। জয় রহমানের কাহিনী শুনে তাকে নির্দোষ হিসেবে বিশ্বাস করে পুনর্বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পাস্তর তৎপর হন। তার এ কাহিনী বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়লে পুনর্বিচারের দাবিতে জয় রহমানের সপক্ষে সুইডেনের বড় তিনটি জেলখানা হাল, তিদাহল ও কুমলায় একযোগে সব কয়েদিরা ধর্মঘট পালন করে '৯৬ সালে এবং পরবর্তীতেও কয়েদিদের তৎপরতা নানাভাবে অব্যাহত থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ বছর পর কুমলা জেল থেকে জয় রহমানকে স্থানান্তর করা হয় হাল জেলখানায় '৯৯ সালের ২৮ ডিসেম্বরে।

এর মধ্যে '৯৬ সালে কুমলা জেলখানায় এসে হাজির হন সাংবাদিক ডিক সুন্দেভাল। সেখানকার আস্থা পরিষদের (Fortroenderadets) সভাপতি তাকে জানান, এখানে একজন নির্দোষ কয়েদি আছে। তার সম্পর্কে সুন্দেভাল আদ্যোপান্ত জেনে নিয়ে

সুইডেনের বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখায়নি কেউ। এরপর ডিক সুন্দেভালের বন্ধু সুইডিশ টিভি চ্যানেল TV5-এর চীফ প্রোগ্রামার ঘটনাটি শুনে তাকে কিছু অর্থ দেন এর ওপর একটা ডুকমেন্টারি করার জন্য। ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে জয় রহমানের নির্দোষিতার বহু তথ্য। '৯৭ সালে এই ডকুমেন্টারিটি দেখানো হয় সুইডিশ টিভিতে। এই ডকুমেন্টারি করতে গিয়েই ডিক সুন্দেভালের প্রথম ধারণা জন্মে– অভিবাসী শ্রেণীর ওপর বিচার বিভাগের কঠোর মনোভাবের বিষয়টি।

টিভিতে ডকুমেন্টারি প্রচারিত হবার পর অ্যাডভোকেট পিটার আলথিন বিনা পারিশ্রমিকে জয় রহমানের কেসটি পুনর্বিচারের জন্যে ফাইট করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। '৯৭ ও '৯৮ সালে পর পর দু'বার সুপ্রিম কোর্ট থেকে আবেদন খারিজ করা হয়। বলা হয়, আসামিকে নির্দোষ প্রমাণের মতো উপযুক্ত কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। জয় রহমান আশা ছেড়ে দেন। পরে ডিক সুন্দেভাল ও পাস্তর বেঙ্কট ইয়োরান উহানসনের উৎসাহে আবারও আবেদন জানানো হয়। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট পুনর্বিচারের আবেদন গ্রহণ করে। এই হত্যাকাণ্ডে প্রতিবেশী এক সাক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান উপস্থাপন করার ফলে বিচার প্রক্রিয়া নতুন দিকে মোড় নেয়।

হত্যাকাণ্ডের ৪ বছর পর টিভিতে ডকুমেন্টারি দেখে ৭৭ বছর বয়স্কা প্রতিবেশী এক মহিলা এ বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সহকারী প্রধান প্রসিকিউটর আদালতে সাব্যস্ত করেছেন, হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে ১৯৯৩ সালের ২১ মে শুক্রবার বেলা তিনটা কুড়ি মিনিট থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে। কিন্তু এই তথ্য ঠিক নয়। তিনি নিজেই রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বৃদ্ধার ফ্ল্যাট থেকে এক ভয়াবহ মৃত্যু চিৎকার শোনেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি তার মেয়েকে ঐ ফ্ল্যাটে কারো খুন হওয়ার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। সুতরাং এই সাক্ষ্য অনুযায়ী আদালতের প্রমাণিত সময়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। এছাড়াও জ্বালানি তেল দিয়ে বৃদ্ধার লাশ পুড়িয়ে ফেলার যে চেষ্টা করা হয়েছিলো তা শনিবার বিকেলে ঘাতকের পুনরায় ফ্ল্যাটে প্রবেশের আগে করা হয়নি। কারণ শনিবার দুপুর বারোটা কুড়ি মিনিটে এর পরিচারিকা বৃদ্ধার দরজায় দীর্ঘক্ষণ কলিং বেল টিপেও কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে যান। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেও অগ্নিসংযোগের গন্ধ তিনি পাননি। সুতরাং অগ্নিসংযোগ ঘটেছে ঐ সময়ের পরে। এটা ফায়ার এক্সপার্টদের কারিগরি পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। অপরদিকে ঐ ফ্ল্যাটের চাবিও ছিল না জয় রহমানের কাছে এবং শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির এই দু'টি দিন রহমান কাটিয়েছে তার পরিবারের সাথে। রহমানের কাছে বৃদ্ধার ফ্ল্যাটের চাবি থাকার বিষয়টি প্রমাণ করা যায়নি।

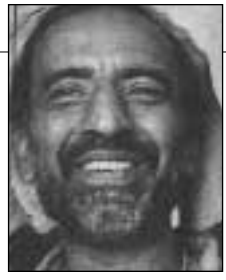

'টিভিতে ডকুমেন্টারি প্রচারিত হবার পর অ্যাডভোকেট পিটার আলথিন বিনা পারিশ্রমিকে জয় রহমানের কেসটি পুনর্বিচারের জন্যে ফাইট করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। '৯৭ ও '৯৮ সালে পর পর দু'বার সুপ্রিম কোর্ট থেকে আবেদন খারিজ করা হয়। বলা হয়, আসামিকে নির্দোষ প্রমাণের মতো উপযুক্ত কোনো তথ্য প্রমাণ নেই'

নতুন DNA টেস্টে দেখা গেছে, বৃদ্ধার প্যান্টে প্রাপ্ত যে দু'টি চুলকে ইতিপূর্বে রহমানের বলে প্রমাণ করা হয়েছিল– তা সঠিক নয়। যে ফিতাটি দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছে তা ৭টি ভিন্ন পরীক্ষায় একই ওয়ালমেটের বলে শনাক্ত করা যায়নি। এছাড়া অর্থের লোভে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর যে কথা বলা হয়েছে, তাও ধোপে টেকেনি। কারণ হত্যাকাণ্ডের সময় জয় রহমান ও তার স্ত্রী মোনিকা রহমানের ব্যাংক একাউন্টে এক লাখ আঠারো হাজার ক্রোনার সঞ্চিত ছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি FBI বিশেষজ্ঞ গ্রেগ ম্যাককার্থি গবেষণা করে জানান, ঘাতক-বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ পরিচিত কোনো নিকট প্রতিবেশী মাদকাসক্ত ব্যক্তিই হতে পারে। প্রাপ্ত আলামতগুলো থেকে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই হাইকোর্টের আদেশে জয় রহমান ১৯ এপ্রিল মুক্তিলাভ করে বীরের বেশে বিকেলে বাড়ি ফেরেন। আগে থেকেই তার শ্যারহোলমেনের ছোট্ট ফ্ল্যাটে শত শত সাংবাদিক ও উৎসুক জনতা ফুল নিয়ে উপচে পড়ে। পরিবারের বয়ে যায় বাঁধ ভাঙা আনন্দের বন্যা। সেই আনন্দের জোয়ারে শরিক হয় তাবৎ উৎসুক জনতা। এদিন ও পরের দিন তাবৎ সংবাদ মাধ্যমে শীর্ষস্থান দখল ছাড়াও জয় রহমান সর্বত্রই হয়ে ওঠেন টক অব দ্য সুইডেন । পরে ২১ মে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে। এই রায়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়।

জয় রহমানের একটি একান্ত সাক্ষাৎকার

সুইডেনে ক্ষতিপূরণের অর্থপ্রাপ্তদের তালিকা

ভুল বিচারের জন্যে সুইডেনে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন নিজ মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত মালমো শহরের মধ্যবয়সী একজন অধিবাসী ১৯৯২ সালে। সাড়ে তিন বছর সাজা খাটার পর হাইকোর্ট কর্তৃক তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুইডিশ সরকারের কাছ থেকে ৬.১ মিলিয়ন ক্রোনার লাভ করেন।

ক্রিস্টার পিটারসন : সুইডেনের শান্তিবাদী সোসাল ডেমোক্র্যাট নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমেকে ১৯৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি হত্যার দায়ে ১৯৮৯ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক্রিস্টার পিটারসনকে সুপ্রিমকোর্টে পুনর্বিচারের মাধ্যমে নির্দোষ হিসেবে মুক্তি দিলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি তিন লাখ ক্রোনার আদায় করে নেন।

ইয়াসির আসকার : সেন্ট্রাল স্টকহোমের একটি PUB -এ ১৯৯৮ সালে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের সাজা লাভ করেন। দুই বছর পর সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিচারের সুযোগে হাইকোর্ট থেকে বেকসুর খালাস হন। ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন ১০ মিলিয়ন ক্রোনার। পেয়েছেন চার লক্ষ ক্রোনার।

কিথ সেদার হোল্ম : ১৯৭৯ সালে অগ্নিকাণ্ডে মানুষ হত্যার দায়ে ১৯৯২ সালে হাইকোর্ট কর্তৃক ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হন। প্রায় তিন বছর সাজা খাটার পর সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক নির্দোষ হিসেবে মুক্তি লাভ করেন। মানসিক যন্ত্রণাভোগের জন্যে ক্ষতিপূরণ পান চার লাখ ক্রোনার আর আয় থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে এক লাখ পনেরো হাজার ক্রোনার।

উমিও শহরের অধিবাসী এক ব্যক্তিকে মানসিক যন্ত্রণাভোগ ও উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে দেয়া হয় সাত লাখ ক্রোনার ক্ষতিপূরণ। নিজ মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে তিনি দুই বছর জেলের সাজা খেটে পরে নির্দোষ হিসেবে খালাস পান।

সুইডেনের পশ্চিমাঞ্চলের এক অধিবাসীকে আপন ছেলের ১২ বছর বয়সী দুই সৎ মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে দুই বছরের সাজা প্রদান করে। সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিচারের মাধ্যমে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। লাভ করেন সাড়ে পাঁচ লাখ ক্রোনার ক্ষতিপূরণ।

নেয়ার জন্যে তার বাসায় বার বার ফোন করেও যখন নাম্বারটি ভুল প্রমাণিত হলো তখন দৈনিক আফতোন ব্লাদেতের কৌতুকপ্রিয় সাংবাদিক ষ্তান্তে লিদেনের শরণাপন্ন হতেই তিনি অফুরন্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে বললেন, ও মাই গড, হি ইজ গ্রেট, হি ইজ গ্রেট। আই নেভার মেট সাচ এ্যান ইনসিডেন্ট ইন মাই লাইফ। ডু ইউ নো হোয়ার ডাস হি কাম্স ফ্রম! হি ইজ ফ্রম দা সেম এরিয়া অব বাংলাদেশেস গ্রেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমান।

সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য ২০ এপ্রিল যখন জয় রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো তখনও তার বাসায় গিজ গিজ করছে সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের নানান মানুষ। ক্লান্তিতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। মুখ দিয়ে পরিষ্কার কথা ফুটছিলো না। পরের দিন পুরোপুরি বুকড্ হওয়া সত্ত্বেও জোর তাগাদা দিয়েই আদায় করে নিলাম সাক্ষাতের সময়।

২১ এপ্রিল বিকেলে তার শ্যারহোলমেনের বাসায় পৌছুতেই দরজা খুলে দিলেন জয় রহমান। ছোট খাটো হাল্কা-পাতলা গড়নের খোঁচা খোঁচা চাপদাড়ি মুখে ৫২ বছর বয়সী কৃষ্ণকায় জয় রহমানকে ছবিতে যেমন যেভাবে বেশভূষায় দেখেছিলাম অবিকল সেই জয় রহমানকেই দেখলাম প্রথম স্বশরীরে। অকুপাইড ড্রইং রুমে না বসিয়ে বসালেন কিচেনে। ওখানে বসেই নেয়া হলো তার সাক্ষাৎকার। এলেন মনিকা। তার প্রতিক্রিয়া কি জানতে চাইতেই ক্লান্ত উদাস সুরে জানালেন– প্রতিক্রিয়া আর কি জানাবো, ও সম্পর্কে এখন বলার কিছুই নেই। এখনও অনেক কিছু করার আছে। ২১ মে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় প্রদানের ওপর ইঙ্গিত করেই ক্লান্ত সুরে বললেন এসব কথা। খানিকক্ষণ পরে ভিডিও ক্যামেরা হাতে কিচেনে এলো ঝিলিক রহমান। বাংলা মোটেও জানেন না। একটু ভিডিও করে সুইডিশে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে বিদায় নিলো। টেপ নিয়ে জয় রহমানের সঙ্গে শুরু করলাম আলাপ। আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবে বললেন, দেখতেই পাচ্ছেন বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি খুবই টায়ার্ড। জীবনের ওপর দিয়ে যে ধকল গেলো এবং এই দুইদিন ধরে আরো যে ধকল যাচ্ছে তাতে ভীষণ ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এ কথা বলেই হাতে ন্যাপকিন নিয়ে ইন্টারভিউয়ের সারাটা সময় ঘন ঘন নাক ঝাড়ার বিড়ম্বনা পোহাতে থাকলেন।

তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেই একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ বলে গেলেন সমস্ত ক্ষোভ, অপমান, অভিযোগ ও যন্ত্রণার কথা। বললেন, সুইডিশ জনগণের ট্যাক্সের অর্থে আমি ক্ষতিপূরণ চাই না। অর্থের লোভ আমার নেই। প্রয়োজনও নেই। আমার নিজেরই অনেক টাকা আছে। যা আছে তাই নিয়েই সুখী। যে অর্থের কারণে আমাকে খুনি সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই অর্থের মুখে থুতু ফেলে গোটা সুইডিশ জাতির কাছে আমি প্রমাণ করে দিতে চাই আমি বাঙালি এবং বাংলাদেশের মানুষ। অর্থের জন্যে আমরা মানুষ খুন করি না। আদালতে অর্থের জন্যে বাংলাদেশে মানুষ খুন করার কথা বলে প্রসিকিউটর গোটা বাঙালি জাতির ওপর যে কলঙ্ক লেপন করেছে সেই কলঙ্ক আমি মোচন করতে চাই গোটা সুইডিশ স্টেটকে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। আদালতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমি দীর্ঘদিন সুইডেনে বসবাস করেও সুইডিশ পাসপোর্ট কেন গ্রহণ করিনি। জবাবে বলেছি, আমি বাঙালি। বিশ্বের যে দেশেই যাবো সেখানেই আমার পরিচয় থাকবে বাঙালি ও বাংলাদেশী। এটা আমার গর্ব। সুইডিশ পাসপোর্ট নিয়ে আমি আমার আত্মপরিচয়কে জলাঞ্জলি দেবো কেন? আর সুইডিশ পাসপোর্ট নিলেই কি আমি আমার বাঙালি পরিচয় বদলে ফেলতে পারবো?

সুতরাং আদালতে আমি শুধু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যেই নয়, নিজের আইডেন্টিটি রক্ষার জন্যেও ফাইট করেছি।

আদালতের বর্ণবিদ্বেষমূলক এই অন্যায় রায় আমি মেনে নেইনি। কারণ এই রায় শুধু ব্যক্তি জয় রহমান ও তার ফ্যামিলির কলঙ্ক নয়, এটা ছিলো গোটা বাঙালি জাতির ওপর লেপন করা এক আমোচনীয় কলঙ্ক। আমি ফাইট না করলে এই কলঙ্কের দাগ আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও গোটা জাতির ওপর থেকে যেতো, আমি মারা যাবার পরও। তাই আমি জেলে থেকে সর্বপ্রচেষ্টা দিয়ে সবখানে যোগাযোগ করেছি। হাজার হাজার চিঠি দিয়েছি। ফলে জেলে থেকে বহু মানুষের সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেছি। প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি এসেছে। এই মামলা লড়ার জন্যে সেই চিঠির সাথে তারা টাকাও পাঠিয়েছে। জেলে এসে বহু মানুষ দেখা করেছে। তারা জানতে চেয়েছে, অগ্রগতি কতদূর। তারা আরো কিভাবে সাহায্য করতে পারে, এই প্রশ্ন বার বার করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করলাম–

তাহলে সুইডিশ সমাজটাকে আপনি কতটুকু বর্ণবিদ্বেষী মনে করেন?

কিছুক্ষণ থেমে এবং খানিকটা চিন্তা করে সতর্ক জবাবে বললেন, দেখুন, সুইডিশরা কর্মব্যস্ত জাতি। নিজ নিজ জীবন নিয়েই তারা ব্যস্ত। বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা করার এতো অবকাশ কই। তবে হ্যাঁ, '৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব ও নানান কারণে যে বর্ণবিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল,

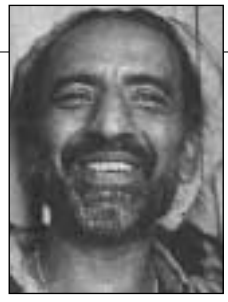

'আমি দীর্ঘদিন সুইডেনে বসবাস করেও সুইডিশ পাসপোর্ট কেন গ্রহণ করিনি। জবাবে বলেছি, আমি বাঙালি। বিশ্বের যে দেশেই যাবো সেখানেই আমার পরিচয় থাকবে বাঙালি ও বাংলাদেশী। এটা আমার গর্ব। সুইডিশ পাসপোর্ট নিয়ে আমি আমার আত্মপরিচয়কে জলাঞ্জলি দেবো কেন? আর সুইডিশ পাসপোর্ট নিলেই কি আমি আমার বাঙালি পরিচয় বদলে ফেলতে পারবো?'

সেটা তো এখন নেই। তবে সত্যি কথা হলো কি, সামাজিক স্তরে ওটা না থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে, অফিসিয়ালি এটার অস্তিত্ব আছে। এই যেমন ধরেন আমার বিষয়টা। সুইডিশ জনগণের সহযোগিতা-সহমর্মিতা পেলেও আমি শুধু অফিসিয়াল বর্ণবিদ্বেষের কারণে অন্যায় বিচারের সাজা পেলাম। তবে সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন? এমন একটি অন্যায় ঘটনার বিরুদ্ধে আমি একাই ফাইট করে গেলাম। আমার সাহায্যে কিংবা অন্যায় বিচারের প্রতিবাদে আজ পর্যন্ত একটা বাঙালিও এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে আসেনি কেউ একটু সহমর্মিতা জানাতে। এখানে এতো দল, সংগঠন আছে তারাও কোনো খোঁজ-খবর করেনি। এ জন্যে সুইডিশদের কাছেও আমার মাথা হেট হয়ে গেছে। তারাও প্রশ্ন করেছে তোমার দেশের ভাইরা, তোমার দেশের প্রবাসী সংগঠনগুলো এগিয়ে এলো না কেন? তাহলে বলেন, এই সংগঠনগুলো কি জন্যে আছে? তারা কি কাজ করছে? তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ রক্ষা, আইডেন্টিটি তৈরি ও সুবিধাবাদের জন্যেই এই সংগঠন করছে। আই হেট অল দিস রাবিস...। জানেন এজন্যে আমি কোনো বাঙালির সঙ্গে মিশি না। সুইডিশরা মোর বেটার দ্যান অল দিস সিটস। আমি এদের কেয়ার করি না।

প্রশ্ন করলাম আপনার নাকি হাশিশের নেশা আছে? রহমানের সোজা সাপটা জবাব– হ্যাঁ, আছে। অসুবিধা কোথায়? আপনার মতো এ প্রশ্ন একদিন জেলখানায় জেলার সাহেবও করেছিলো। বলেছি এ হাশিশ তো তুমিই আমাকে দাও। তুমি হলে এই জেলখানার চিফ, রক্ষক, তদারক। তোমার তদারকির চোখ ফাঁকি দিয়ে এ হাশিশ এখানে আসে কিভাবে, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তুমিই তো দাও আমাকে। এটা খাওয়া তো দোষের কিছু নয়। এটা আমার রাইট। আমি তো এটা খেয়ে কারো অনিষ্ট করছি না, মানুষ খুন করছি না। এই নিঃসঙ্গ জেলখানায় আমি বাঁচবো কি নিয়ে বলো?